OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 338 - 345
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 338 - 345
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

মিথপুরাণ নান্দনিকতা এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে শঙ্খশিল্প

ড. দেবতুষি মিশ্র চৌধুরী
অধ্যাপিকা, সরোজিনী নাইডু কলেজ ফর উইমেন
Email ID : debtusimisra@gmaiil.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Mythical aspect, Religious matter, Zoological element, Folk-belief, Multivarious use, Folk-ethics, Asthetic art,

Abstract
Counch had a great multivarious stand. We can know about the old art craft of counch by reading the history of indus valley. Counch art is discovered from under ground as a part of Harhappa civilization. By exclusive sound value and excellent structure Counch was used in many platform. Like to announce good news of male child birth or any good rituals, announcement of battle or end or break of it. Counch has a religious value too. We often make sound of counch in many riligious matter and to worship god. It is said that by the use of three times sound of counch we pray to Brahma, Bisnu, Maheswar. Many myth has made with the sound of counch or with the birth of counch. Counch is also used to made jewellery and show- pieces. With counch there is many belief also. We can found about counch in our literature like Shibayan and folk-literature, pro-verb, riddle also. Many people throughout the Bengal related with this Counch art. We can find the change of the total procedure of this art. Kolmijor of Daspur, Paschim Medinipur is a great nane today in Counch Art with their Rupam Shankha Shilpalaya. Dutta families played agreat role their. They made the counch art aesthetically attracted as well as the workers also happy with their income.

Discussion

“এখান থেকে দিলাম সাড়া
সাড়া গেল বামুনপাড়া”

- লোকসমাজে প্রচলিত এই ধাঁধার উত্তর শাঁখ।

শুভ সংবাদ জ্ঞাপনে শঙ্খ ধ্বনি করা আমাদের প্রাচীন রীতি। পুত্র সন্তান জন্মালে সেই সংবাদটি গর্বের সঙ্গে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এক সময় আমাদের হিন্দু পরিবারে শঙ্খ ধ্বনি হত। বাল্মিকী রামায়ণ অনুযায়ী চোদ্দ বছর বনবাস অতিক্রম করে রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে আসলে ভরত শাঁখ বাজিয়ে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন। আবার সমরাঙ্গনেও যুদ্ধের সূচনা ঘোষণায় শঙ্খ ধ্বনি করা হত কিংবা কখনো যুদ্ধ বিরতিতে বা যুদ্ধ সমাপ্তিতে শঙ্খ ধ্বনি করে খবর সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 338 - 345
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হত। ব্যাসদেব মহাভারতের যুদ্ধে পাঞ্চজন্য, দেবদত্ত, অনন্ত বিজয়, পৌন্ড্র, মণিপুষ্পক ইত্যাদি শাঁখের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন। হিন্দু পরিবারে সন্ধ্যাবেলা শঙ্খ ধ্বনি একটি প্রাত্যহিক ধর্মীয় পবিত্র রীতি বলে মান্যতা পায়। কেবল শুভ সংবাদ জ্ঞাপনে কিংবা যুদ্ধের সংবাদ জ্ঞাপনে অথবা পবিত্র ধর্মীয় পরিবেশে নয় শঙ্খ ধ্বনির দূরত্ব অতিক্রমী বৈশিষ্টটি সংকেত পাঠানোর ক্ষেত্রেও পুরা কাল থেকে কাজে লাগানো হয়। শঙ্খের ব্যবহার বহু প্রাচীন। হরপ্পা সভ্যতা এবং তার পূর্বেও শঙ্খের ব্যবহার হত এমন নিদর্শন মেলে। ২০০০ বছর প্রাচীন তামিলনাড়ুর রাজধানী কোরকাই এর ভগ্নস্তুপ থেকে শঙ্খ ও শঙ্খ শিল্পের নানা নিদর্শন উদ্ধার করা হয়েছে। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে লেখা তামিল কাব্য মান্দুরাক্কাঞ্চি এবং সিলাপ্পাথিকারাম্ এ শঙ্খের কথা উঠে এসেছে। যদিও বেদে শঙ্খ শব্দের প্রত্যক্ষ উল্লেখ নেই। কিন্তু, তবু বকুর এবং গোমুখ শব্দ দুটিকে শঙ্খ ব্যবহারের প্রামাণ্য হিসাবে ধরেন পন্ডিতেরা। বাল্মিকী রামায়ণ, কালিদাসের রঘুবংশ, বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্র থেকে শুরু করে বাংলায় বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে, শিবায়নে; এমনকি শিষ্ট সাহিত্যের পাশাপাশি মুখে মুখে প্রচলিত নানান লোককথা রূপকথায় এসেছে শঙ্খের প্রসঙ্গ। উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা সর্বত্রই হিন্দুধর্মে ধর্মাচরণের একটি অত্যন্ত সনাতনী বিষয় হিসাবে শাঁখের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। শাঁখের একটি আধ্যাত্মিক অবস্থান রয়েছে। নানান পূজা পার্বণে কিংবা যজ্ঞে কিংবা শুভ অনুষ্ঠানে শঙ্খ ধ্বনি অতি পবিত্র এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাঙালি হিন্দু নারী তার সধবার চিহ্ন স্বরূপ এই শঙ্খ থেকে প্রস্তুত শাঁখা পরেন। যদিও অনেকের মতে দক্ষিণ ভারতেও এক সময় নারীরা শাঁখা পরিধান করতেন এবং তাঁদের মত দক্ষিণ ভারত থেকেই আমাদের বাংলায় সধবার চিহ্ন স্বরূপ শঙ্খ পরিধান রীতি এসেছে। যদিও পরবর্তীকালে দক্ষিণ ভারতে মুসলিম এবং খ্রিস্টান শাসনকালে সেই প্রথা অবলুপ্ত হয়। শিবায়নে সধবা গৌরীর শাঁখা পরার বৃত্তান্ত উঠে এসেছে। শাঁখারির ছদ্মবেশে আশা শিবকে শাঁখারি ভেবে তাঁর কাছে শাঁখার দাম জিজ্ঞেস করেছে সে —

> “শাঁখারি ভালো এনেছ শঙ্খ
> শঙ্খের কত নিবে তঙ্ক।”

ইতিহাস অনুসরণে লক্ষ্য করা যায় করমন্ডল উপকূলের কর্ণাটকের বাসিন্দারা প্রথমাবধি শঙ্খ শিল্পের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। ধনপতি সওদাগরকে এদের পূর্বপুরুষ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ইসলাম অত্যাচারে অত্যাচারিত কিছু কিছু হিন্দু শঙ্খ বণিক দ্বাদশ শতকে বল্লাল সেনের রাজত্বকালে কর্ণাটক থেকে ঢাকার বিক্রমপুরে এসে বসবাস শুরু করেন। মুঘল রাজত্বকালে ঢাকার নির্দিষ্ট অঞ্চলেই ছিল শাঁখারীদের বসবাস। ঐতিহাসিকদের একাংশের মত ঢাকা থেকেই পরবর্তীকালে ভারতের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন শঙ্খ শিল্পীরা।

পুরাণেও এই শঙ্খের নিদর্শন মেলে। হিন্দু ধর্মে যে বিষ্ণু নানা অবতারে যখনই পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণ হয়েছে আবির্ভূত হয়েছেন সেই পাপ মোচনের জন্য, সেই বিষ্ণু চতুর্ভুজ— শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। বিষ্ণুর শঙ্খের নাম পাঞ্চজন্য। এই শঙ্খটি ছিল চন্দ্রবনের অধিপতি দানব পাঞ্চজনের। বিশ্বকর্মা পঞ্চজনকে হত্যা করে তার শাঁখটি নিয়ে আসেন এবং তা উপঢৌকন হিসাবে বিষ্ণুকে দেন।

বিষ্ণুর হাতে শঙ্খ থাকলেও ত্রি-দেবতার অন্যতম শিবালয়ে পাণিশঙ্খ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। এর কারণ নির্ণয়ে শঙ্খের জন্ম বৃত্তান্তট বিস্তৃত করা যেতে পারে এই অংশে। পুরাণ অনুসারে একদিন গোলকধামে রাধার অনুপস্থিতিতে শ্রীকৃষ্ণ সখী বিরজার সঙ্গে বিহার করছিলেন। রাধা ফিরে এসে কৃষ্ণ এবং বিরজাকে একত্র দেখে ক্রোধবশত বিরজার উদ্দেশ্যে এমন কিছু ক্রুদ্ধ শব্দ ব্যবহার করেন যা শুনে বিরজা অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়েন। পরবর্তীকালে লজ্জাবত নদীর রূপ ধারণ করে প্রবাহিত হতে শুরু করেন বিরজা। অন্যদিকে রাধার নিষ্ঠুর শব্দে কৃষ্ণের বন্ধু সুদামাও ক্ষুণ্ণ হন। তিনি রাধার কাছে উচ্চস্বরে নিজের ক্ষোভ উগরে দেন। অসন্তুষ্ট রাধা সুদামার এহেন আচরণে তাকে দানব রূপে জন্মগ্রহণ করার অভিশাপ দেন। রাধারানীর শাপে অভিশপ্ত সুদামা দানব বংশে শঙ্খচূড় নামক দানব হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। শিব পুরাণে দম্ভের পুত্র শঙ্খচুড়ের বর্ণনা মেলে। তিনি তিন লোকের অধীশ্বর হয়ে উঠেছিলেন। কারণ দেবতা এবং দানবদের যুদ্ধে একবার দানবেরা শঙ্খচূড় নামক এক নেতার নেতৃত্বে দেবতাদের কাছ থেকে স্বর্গসুখ ছিনিয়ে নেয়। দেবতারা প্রথমে যান বিষ্ণুর কাছে এবং তারপর বিষ্ণুর পরামর্শ অনুযায়ী যান শিবের কাছে। দেবতাদের দুঃখে শিব চিন্তিত হন এবং বহু কৌশল

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 338 - 345
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অবলম্বন করে শেষে ত্রিশূল দিয়ে বধ করেন শঙ্খচূড়কে। শুধু তাই নয়, ক্রুদ্ধ দেবাদিদেব শঙ্খচূড়ের অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করে তুলতে তার হাড় গুঁড়ো করে ছড়িয়ে দেন বঙ্গোপসাগরে। মনে করা হয় শঙ্খচুড় দানবের সেই হাড়গুঁড়ো থেকেই পরবর্তীকালে বিষ্ণুর কৃপায় জন্ম হয়েছে শঙ্খের। কিন্তু এ ঘটনায় দেবতাদের জল দেওয়ার জন্য পানিশঙ্খ ব্যবহার করা হলেও শিবালয়ে পাণি শঙ্খ ব্যবহার করলে শঙ্খচূড়ের স্মৃতি স্মরণে শিব অসন্তুষ্ট হবেন এই ধারণা থেকে শিবালয়ে পাণি শঙ্খের ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়ে যায়। শিবালয় নয়, সূর্য মন্দিরেও শঙ্খ ধ্বনি নিষিদ্ধ।

বদ্রিনাথ এর মন্দিরেও শঙ্খ ধ্বনি করা নিষিদ্ধ। এর কারণ হিসাবে নানা তথ্য উঠে আসে। কারো মতে বদ্রিনাথ ধামে দেবী লক্ষ্মী তুলসী রূপে ধ্যানমগ্না। শঙ্খ ধ্বনি করে ভগবান বিষ্ণু তাঁর ধ্যানের একাগ্রতা ভঙ্গ করতে চাননি। তাই সেখানে শঙ্খধ্বনি নিষিদ্ধ। আবার কারোর মতে হিমালয় রাক্ষস অধ্যুষিত অঞ্চল। রাক্ষসদের অত্যাচারে মুনি ঋষিদের পূজার্চনা, যজ্ঞ হোমে বিঘ্ন ঘটতো। রাক্ষসদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ঋষি অগস্ত্য মাতা ভগবতীর সাহায্যপ্রার্থী হন। দেবী ভগবতী কুষ্মান্ডদেবী রূপে ত্রিশূল সহযোগে সব রাক্ষসদের হত্যা করেন কিন্তু অতাপি এবং বতাপী নামে দুই রাক্ষস পালিয়ে যায়। অতাপি মন্দাকিনী নদীতে ঝাঁপ দেয় আর বতাপী বদ্রিনাথের মন্দিরে শঙ্খের ভিতর আশ্রয় নেয়। বদ্রিনাথ মন্দিরে শঙ্খ ধ্বনি করলে শঙ্খ থেকে বতাপী রাক্ষস বেরিয়ে আসতে পারে। তাই অনভিপ্রেত বিষয়টি আটকানোর জন্য বদ্রিনাথ মন্দিরে শঙ্খ ধ্বনি হয় না। কেউ আবার বদ্রিনাথ মন্দিরে শঙ্খ ধ্বনি না করার পেছনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেখিয়েছেন। তাদের মতে শঙ্খের ধ্বনি তরঙ্গে হিমালয়ের পাহাড়ে ধ্বস নামতে পারে। তাই প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা এড়াতে বদ্রিনাথ মন্দিরে শঙ্খ ধ্বনি নিষিদ্ধ। বিপরীত ভাবনার পাশাপাশি আবার পুরাণ কাহিনীতে মেলে শঙ্খ বাজিয়ে ভগীরথের গঙ্গাকে মর্ত্যে নিয়ে আসার ঘটনাও।

শাঁখারীদের বিশ্বাস ঋষি অগস্ত্যর আশীর্বাদেই তারা সমুদ্রের তলায় শাঁখ দেখতে পায়, তাদের ব্যবসার যাবতীয় কাঁচামাল সংগৃহীত হয় ঋষি অগস্ত্যর আশীর্বাদে। ফলে তারা কৃতজ্ঞতবশত তাঁর পূজার আয়োজন করেন। পুরাণ অনুসারে অগস্ত্য রামচন্দ্রের বৈষ্ণব ধনু, অক্ষয় তুণ, ব্রহ্মদত্ত তরবারি ইত্যাদি তৈরি করেছিলেন। পুরাণে একথাও স্বীকৃত যে দ্রোণাচার্যের ব্রহ্মশির নামক অস্ত্রটির প্রযুক্তি স্বয়ং ঋষি অগস্ত্যর। সেই সূত্রেই পুরাণে উঠে আসে আরেকটি প্রশ্ন শঙ্খাসুর বধের অস্ত্র কি তবে করাত, আর এই শাঁখের করাতের নির্মিতি কি ঋষি অগস্ত্যরই? এ প্রশ্নের সমাধান যদিও পুরাণে মেলে না, কিন্তু শাঁখারীদের বিশ্বাস অনুসারে শাঁখারীদের উপাস্য দেবতা অগস্ত্যমুনি। এই অগস্ত্য ঋকবেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তাঁর মাতা উর্বশী। পুরাণ অনুসারে উর্বশীর রূপে মুগ্ধ হন মিত্র এবং বরুণ। উভয়ই তাঁকে কামনা করেন। উর্বশী মিত্রকে দেহ দিতে চান এবং বরুণকে তার মন দিতে চান, কিন্তু কেউই দেহ ছাড়া মন বা মন ছাড়া দেহ নিতে রাজি হন না। কিন্তু উর্বশীর এই ইচ্ছা প্রকাশে তাঁরা ঊর্বশীকে অভিশাপ দেন, উর্বশী স্বর্গে সাধারণী হবেন এবং স্বর্গচ্যুত হয়ে পুনর্বার ভোগের সামগ্রী হবেন। কিন্তু ঊর্বশীকে দেখে মিত্র এবং বরুণ উভয়েরই বীর্যপাত ঘটে যায়। সেই বীর্য জলস্তম্ভে রক্ষিত হয়। জলস্তম্ভে সেই বীর্য থেকে জন্ম নেয় অগ্রজ রূপে বশিষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ রূপে ঋষি অগস্ত্য। ঋষি অগস্ত্যর স্ত্রী লোপামুদ্রা এবং পুত্র দৃঢ়স্যু। অগস্ত্য শুভ্রদেহি, তাঁর দুহাত মতান্তরে চার হাত, তাঁর হাতে কমন্ডলু এবং অক্ষয় সূত্র। পুরাণ অনুসারে দধীচির আত্মত্যাগে নির্মিত বজ্র দিয়ে বৃত্রাসুরকে হত্যা করা গেলেও, তারক, কমলাক্ষ, বিরোচন, পরাবসু, কালেয় দানব প্রকৃতি ভয়ানক দানবরা সমুদ্রের তলদেশে জলদুর্গ নির্মাণ করে, সেখানে বসবাস করতে থাকেন, রাত্রিবেলা সমুদ্রের তলদেশ থেকে বেরিয়ে এসে তারা দেবতাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলতে শুরু করে। দেবতারা অমর, কিন্তু তাঁদের জীবন জীবিতেই মৃতপ্রায় হয়ে ওঠে। বিষ্ণুর পরামর্শে ঋষি অগস্ত্য দেবতাদের বাঁচাতে এক গণ্ডুসে সমুদ্রের সমস্ত জল খেয়ে নেন। অস্ত্র এবং শাস্ত্র বিশারদ অবস্থা মুনি অতঃপর দানবদের জল দুর্গ ধ্বংস করে দেন, নিহত হয় সব দানব। তারপর অগস্ত্য মুনি সমুদ্রের সব জল ফিরিয়ে দেন সমুদ্র। সমুদ্র তার পূর্বের রূপ ফিরে পায়। সেখানে নানা সামুদ্রিক জীবের সহজ বিচরণ ক্ষেত্র তৈরি হয়। জন্ম নেয় শঙ্খ।

অপর একটি কাহিনীতে দেখা যায় একবার বিন্ধ্য পর্বত ক্রমাগত উঁচু হতে হতে সূর্যের পথ অবরোধ করে দাঁড়ায়। ফলে বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণের জীবনযাত্রা হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। সূর্য দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে অভিযোগ জানান বিন্ধ্য পর্বতের বিরুদ্ধে। বিন্ধ্য পর্বত ছিলেন অগস্ত্য মুনির শিষ্য। দেবতাদের অনুরোধে ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিন বিন্ধ্য পর্বতের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 338 - 345
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কাছে গিয়ে উপস্থিত হন অগস্ত্য। গুরুকে দেখে বিন্ধ্য পর্বত মাথা নত করে, অগস্ত্য বলেন যতদিন না তিনি ফেরেন ততদিন যেন বিন্ধ্য পর্বত আর মাথা না তোলে, অগস্ত্য দক্ষিণে যাত্রা করেন আর ফেরেন না বিন্ধ্য পর্বতের কাছে। ফলে সূর্যও স্বাভাবিক গতিতে চলতে শুরু করে, বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণের জীবনযাত্রাতেও স্বাভাবিক গতি ফিরে আসে।

ভাদ্র মাসে বিশ্বকর্মা পুজোর দিন শুভ্র বর্ণ শুভ্র শস্ত্রমণ্ডিত চতুর্ভুজ অগস্ত্যর স্ত্রীসহ পুজো হয় কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী-সহ। অগস্ত্যর উপাসনায় মূর্তির রূপ গেছে বদলে। কারণ আগে ঋষি অগস্ত্য, তাঁর পত্নী লোপামুদ্রা এবং পরিদাসীর মূর্তি নির্মিত হতো পূজার জন্য। এখন পরিদাসীর বদলে এসেছে কার্তিক গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী। এ সময় শাঁখের কাজ বন্ধ থাকে। এভাবেই নিজ শক্তির উৎস চিনে নিয়েছেন শঙ্খ শিল্পী তথা শঙ্খের সঙ্গে যুক্ত থাকা আপামর জনতা।

ঋষি অগস্ত্যকে স্মরণ করে, বাংলায় এই শঙ্খকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বহু সংখ্যক মানুষের জীবিকা। মুর্শিদাবাদের বর্ডারে জিতপুর, নদীয়া জেলার বালিয়াডাঙ্গার শঙ্খনগর, কলকাতার উপকণ্ঠে ব্যারাকপুরের তেঁতুলতলা প্রভৃতি অঞ্চলে শাঁখারীদের বসবাস। মুর্শিদাবাদের বর্ডারে জিতপুর নামক অঞ্চলে ২০০ ঘর শাঁখার ব্যবসায়ী আছে। জিতপুর অঞ্চলের শাঁখার ব্যবসায়ীরা ব্যারাকপুর এবং মেদিনীপুর উভয় অঞ্চল থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে থাকেন। বালিয়াডাঙ্গা বা জিতপুরের শঙ্খ ব্যবসায়ীরা সবাই বাংলাদেশী পাল। তারা কেউ শঙ্খ বণিক বা শঙ্খকার নন, তবে বাংলাদেশের খুলনা অঞ্চলের শাঁখার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে একাত্মভাবে অনেকাংশে তারা তাদের ব্যবসাকে বিস্তৃত করেছেন। নদীয়া জেলার বালিয়াডাঙ্গার শঙ্খনগর গ্রামে মেদিনীপুরের দাসপুরের দত্ত শাঁখারিরা তাদের শাখা অফিস বিস্তার করেছেন। পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁচরুল, প্রতাপদিঘী অঞ্চলও শাঁখারীপাড়া হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে বর্তমানে পাঁচরুলে ৫০ থেকে ৬০ ঘর শাঁখার ব্যবসায়ী অবস্থান করেন এবং প্রতাপদিঘিতে প্রায় একশ ঘরের মতো মানুষ এই শাঁখার ব্যবসায় যুক্ত। হাওড়ার যুগীবেড়, ধুমাকাট অঞ্চলও শাঁখার ব্যবসায় বিশেষ খ্যাতনামা। এখানেও প্রতি গ্রামে কুড়ি পঁচিশ ঘর শাঁখারির অবস্থান। বিষ্ণুপুর অঞ্চলেও রয়েছে শাঁখারীপাড়া এবং সেখানেও কুড়ি পঁচিশ ঘর শাঁখারী বসবাস করেন। বিষ্ণুপুর পর্যটকদের জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয় স্থান ফলতঃ পর্যটক সূত্রেই বিষ্ণুপুরের শাঁখারী পাড়ার খ্যাতি বিস্তৃত হয়েছে। বাঁকুড়া জেলার হাটো গ্রামেও রয়েছে ৫০ থেকে ৬০ ঘর শাঁখারী। যদিও আগের এই গ্রামে একশোর উপরে বাড়িতে শাখার কাজ হত কিন্তু বর্তমানে অনিশ্চিত শাঁখার ব্যবসা ছেড়ে নিশ্চিন্ত চাকরির উপর নির্ভরশীল হয়েছেন বেশিরভাগ মানুষ।

পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর থানার অন্তর্গত দত্ত পরিবার বংশপরম্পরায় শাঁখার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। স্বর্গীয় ভবতারণ দত্ত প্রথম এই ব্যবসা শুরু করেন কলকাতা থেকে কাঁচামাল এনে দাসপুরের হাটে তা বিক্রি করেন করতেন তিনি। প্রসঙ্গত এ অঞ্চলে শঙ্খশিল্পের সঙ্গে যুক্ত দুই শ্রেণীর মানুষের কথা জানা যায় এক শঙ্খবণিক অর্থাৎ যারা শঙ্খ নিয়ে ব্যবসা করে আর আর এক শ্রেণী হল— শঙ্খকার অর্থাৎ যারা শঙ্খ তৈরি করেন। এই দুটি পৃথক কাস্ট বা শাখার দুটি পৃথক জাতি। যদিও কার্যক্ষেত্রে শঙ্খকার এবং শঙ্খবণিক উভয়ই শঙ্খ তৈরি করা এবং শঙ্খ নিয়ে ব্যবসা দুটোই করে থাকেন। কাদিলপুর, কলমিজোড়, হরিদেবপুর এই তিনটি গ্রামে শঙ্খ ব্যবসায়ীদের অবস্থান।

৫০-৬০ বছর আগে প্রায় ৪০ ঘর মানুষ এই শঙ্খ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিল যেটা ক্রমশ কমতে কমতে এসে দাঁড়িয়েছে ১৫ ঘরে। আগে কলকাতার বাগবাজার থেকে কাঁচামাল আমদানি করা হত। এখন সরাসরি তামিলনাড়ু থেকে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 338 - 345
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শঙ্খের কাঁচামাল সংগ্রহ করা হয়। করমন্ডল উপকূলে রামেশ্বরম থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকা শঙ্খের কাঁচামালের জন্য উৎকৃষ্ট। এ ছাড়াও চেন্নাইয়ের সমুদ্র সংলগ্ন আরো বেশ কিছু অঞ্চল থেকে এই কাঁচামাল উত্তোলিত হয়। সম্প্রতি প্রায় ত্রিশ বছর আগে থেকে শ্রীলংকা উপকূল থেকে শঙ্খ উত্তোলন শুরু হয়েছে। শ্রীলঙ্কা উপকূলে যেহেতু আগে শাঁখ উত্তোলিত হত না তাই সুপ্রচুর শঙ্খের কাঁচামালের খোঁজ মিলেছে। গত ২০ বছর ধরে সেখান থেকেও কাঁচামাল এক্সপোর্ট হচ্ছে কলকাতাসহ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে। যদিও করোনা পরবর্তী সময় সেই এক্সপোর্ট এর ব্যবসা কিছুটা ধাক্কা খেয়েছে। রামেশ্বরম থেকে ৫০-৬০ কিলোমিটার দূরে টিলাখালী নামক অঞ্চলে সীমিত পরিমাণে শঙ্খ উত্তোলিত হয়। এই অঞ্চলের মানুষের প্রধান জীবিকা, চারপাশের অঞ্চল থেকে শঙ্খের কাঁচামাল সংগ্রহ করে ডিস্ট্রিবিউটার মারফত তা কলকাতা সহ অন্যান্য অঞ্চলে পাঠানো। মূলত নেট সিস্টেমের মাধ্যমে শঙ্খ উত্তোলিত হয়। প্রথমে সমুদ্রের মধ্যে মাছ ধরার মতোই জাল পেতে দিয়ে আসা হয়, সেই জাল তুলে আনা হয়, এবং দেখা যায় জীবন্ত শঙ্খ সেই জালে ধরা পড়েছে। মূলত ধরা পড়ার পর ৪০ ঘন্টা পর্যন্ত এই শঙ্খ গুলি বেঁচে থাকে। বিস্তৃত অঞ্চল থেকে শঙ্খ উত্তোলিত হলেও দেখা যায় সমুদ্রের মধ্যে প্রতি ৫ কিলোমিটার অন্তর শঙ্খের প্রজাতিগত বদলের কারণে প্রতি ৫ কিলোমিটার পর পর পৃথক পৃথক শ্রেণীর শঙ্খ উত্তোলিত হয়। শঙ্খের এক একটি কমিউনিটি একটি অঞ্চলেই ঝাঁক বেঁধে থাকে। ফলে, একই অঞ্চল থেকে সাধারণত একই শ্রেণীর শঙ্খ পাওয়া যায়।

শ্রীলঙ্কায় অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে সমুদ্রে ডুবুরি নামিয়ে শঙ্খ উত্তোলন শুরু হয়। যেহেতু শ্রীলঙ্কায় শঙ্খ উত্তোলন শুরু হয়েছে সম্প্রতি ফলে ডুবুরি মারফত প্রচুর শঙ্খ উত্তোলিত হয়। শ্রীলঙ্কার অনুসরণে ভারতেও এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়। করমন্ডল উপকূলের তিতুকোরিণ-এ এই পদ্ধতিতে প্রথম শঙ্খ উত্তোলন শুরু হয়, কিন্তু ভারী অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে সমুদ্রের ভিতরে কাজ করতে অসুবিধা হওয়ার কারণে কম্প্রেসার সিস্টেমে ওপরে অক্সিজেন সিলিন্ডার রেখে ৩-৪ জন সমুদ্রের গভীরে নেমে ৪-৫ ঘন্টা কাজ করতে শুরু করে এবং দেখা যায় এই পদ্ধতিতে সংখ্যায় অধিক এবং ভালো মানের শঙ্খ উত্তোলিত হচ্ছে শুধু তাই নয় সমুদ্রে বালির তলায় চাপা পড়ে যাওয়া শঙ্খগুলিও এই পদ্ধতিতে অনায়াসে উত্তোলিত হতে শুরু করে ডুবুরিদের মাধ্যমে।

ডুবুরি মাধ্যমে শঙ্খ উত্তোলনে লাভ বেশি হতে থাকে। কারণ এক্ষেত্রে যতক্ষণ মানুষ কাজ করবে ততক্ষণই শঙ্খ উত্তোলিত হতে থাকবে। জালে শঙ্খ উত্তোলন করলে বিষয়টি অনেকখানি অনিশ্চিত হয়ে থাকে। শুধু তাই নয় সারা বছর সমুদ্রের জাল ফেলে শঙ্খ ধরা যায় না। নিয়ম মেনে আনুমানিক প্রায় ছ'মাস সমুদ্রে জল ফেলে জাল ফেলে শঙ্খ তোলা যায় বালি চাপা পড়ে থাকা শঙ্খগুলি যা তাদের ভাষায় ঠগা মাল তা তোলার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। তাই শঙ্খ ব্যবসায়ীরা ডুবুরীর সাহায্যে কাঁচামাল তোলার পদ্ধতিকেই অধিক গ্রহণযোগ্য করে তোলে। এই পদ্ধতিতে উত্তোলিত কাঁচামালের দামও বেশ কম পড়ে। ফলে গত ১৫ বছর যাবত এই পদ্ধতি অধিক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। বড়বাজারের কলুটোলা অঞ্চলে যেখান থেকে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে শঙ্খ কাঁচামাল সরবরাহ হত, সেখানকার কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবসা ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্যারাকপুর হাওড়া মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের শঙ্খ ব্যবসায়ীরা তামিলনাড়ু থেকে সরাসরি কাঁচামাল কেনায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। দাসপুরের শঙ্খ ব্যবসায়ীরা তামিলনাড়ুতে নিজস্ব অফিস প্রতিষ্ঠা করে। কেবল নিজস্ব কাঁচামাল নিজে সংগ্রহ করা নয়, ভারতের বিভিন্ন জায়গায় তাদের কাঁচামালের কাঁচামাল সরবরাহের শাখা অফিস তৈরি হয়।

শঙ্খ অর্থাৎ শামুক প্রজাতির এই জীব। ফলে জীবন্ত অবস্থায় ধরা পড়া শঙ্খের গুণগতমান অনেক ভালো হয় কারণ মৃত শঙ্খের খোল হয় ভঙ্গুর। জীবিত অবস্থায় ধরা পড়া শঙ্খের খোলটি অনেক বেশি টেকসই হয়ে থাকে।

কাঁচামাল সংগ্রহ করে নিয়ে আসার পর চলে বাছাইয়ের কাজ গুণগতমান অনুযায়ী এবং আকৃতি অনুযায়ী শঙ্খগুলিকে বাছাই করা হয়। ভালো শঙ্খগুলিকে বলা হয় Super Special High Quality. এর A, B, C তিনটি quality আছে। এরপরের কোয়ালিটিকে বলা হয় Special VIP, এরপর রয়েছে RSS Special (এর মুখটা দেখতে ভোঁতা কিন্তু একটু ভালো করে কেটে নিলে এর সাহায্যে ভালো শাঁখা তৈরি হয়), সর্বনিম্নমানের শঙ্খকে বলা হয় ডি কোয়ালিটির শঙ্খ। প্রসঙ্গত কিছু প্রজাতির শঙ্খের নাম দেওয়া গেল— পাটি, খগা, ঠগা, আর. এসআই, জাডকি, আলাবিলা, রামেশ্বরী, ঢলা, দোয়ানি, জিআরপি, তিতকৌড়ি বা তিতপুটি ইত্যাদি। এর মধ্যে তিতকৌড়ি গুণমানে শ্রেষ্ঠ এবং আলাবিলা নিকৃষ্ট। আবার

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 338 - 345
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ব্যবহারের দিক দিয়ে শাঁখ দুই প্রকার— একটি শঙ্খ হিসেবে ব্যবহৃত যা ধর্মীয় নানান কাজে ব্যবহৃত হয়। আর এক প্রকার শঙ্খ যা দ্বারা সধবা নারীর অলংকার, হাতে পরার শাঁখা তৈরি হয়। ধর্মীয় কাজে ব্যবহৃত শঙ্খ আবার দু-প্রকার একটি বাজানোর কাজে ব্যবহৃত হয়, অন্যটি পাণিশঙ্খ— যা দেব দেবীদের জল দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। আবার প্রকৃতিগত দিক থেকে শঙ্খ দু-প্রকার বামাবর্ত এবং দক্ষিণাবর্ত। নানান কাজে ব্যবহৃত শঙ্খ মূলত হয় বামাবর্ত শাঁখ। দক্ষিণাবর্ত শাঁখ খুবই দুর্লভ, দুর্মূল্য। দক্ষিণাবর্ত শঙ্খের এক একটি শাঁখ কোটি টাকার কাছাকাছি মূল্য নির্ধারিত হয়।

রামেশ্বরম এর শিঙ্গি অঞ্চলের শঙ্খ খুব চড়া দামে কেনা হয়ে থাকে। শাঁখারীদের ভাষায় একে বলা হয় RSI. R For Rameshwaram, SI For Shingi. কাঁচামাল হিসাবে তোলা শঙ্খগুলিতে ভালো করে কাঠের গুঁড়ো মাখিয়ে প্যাকেটিং করা হয়। কোন প্যাকেটে কুড়িটি বা চল্লিশটি শঙ্খ থাকে। কাঠের গুঁড়ো মাখানো হয় কারণ যাতে শাঁখে অবস্থিত প্রাণীটির রস পচে গলে বাইরে না চলে আসতে পারে। এরপর এই অবস্থায় কেনা কাঁচামালগুলিকে ২-৩ দিন জলের মধ্যে ডুবিয়ে রেখে দিলেই একদিক দিয়ে কাঠের গুঁড়ো ধুয়ে যায় অন্যদিকে এর ভেতরে থাকা প্রাণীটির দেহাবশেষ পরিষ্কার হয়ে যায়। এরপর ছেনি, হাতুড়ি দিয়ে কেটে তারপরে রেক কাটিং হয়। শাঁখা যে অলংকার হিসাবে পরা হয় তার সেই প্রত্যেকটা পিস কাটা কে বলা হয় রেক কাটান।

৫০-৬০ বছর আগে শাঁখার কাজের পুরোটাই ছিল হান্ডিক্রাফ্ট। অর্থাৎ, তখন হাতে করেই কাটা হত শাঁখ। ফাইল, শাঁখের করাত, কাঠের তৈরি দোহনাবাড়ী ইত্যাদি যন্ত্র সহযোগে হাতে করে শাঁখকে ইচ্ছামত রূপ দেওয়া হত। শাঁখকে পরিষ্কার করার জন্য, বিশেষ করে শাঁখের অভ্যন্তর ভাগ পরিষ্কার করার জন্য বালি এবং আঁঠা সহযোগে একটি দন্ড বানানো হত এবং সেটি দিয়ে ঘষে ঘষেই পরিষ্কার করা হত শাঁখ। দ্রুতির যুগে সময় বাঁচাতে এবং উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বর্তমানে শঙ্খশিল্প পুরোপুরি মেশিনের উপর নির্ভরশীল। শঙ্খ পরিষ্কার থেকে শঙ্খ কাটা সবটুকুনিই হয় মেশিনে।

কলমিজোড় গ্রামের সুজিত কুমার দত্ত কেবল শঙ্খ উৎপাদন নয় শঙ্খে বা শাঁখায় শিল্পসৌকর্য ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রেও মেশিনকে ব্যবহার করা শুরু করেন। শান বসিয়ে তার সাহায্যে শাঁখার মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হতে শুরু করে অপূর্ব শিল্পশৈলী, নকশা। এর পেছনে সুজিত দত্তের পিতা স্বর্গীয় ভাবতারণ দত্ত-এর অবদান অনস্বীকার্য। প্রখ্যাত মৃৎশিল্পী ভবতারণ দত্ত, আশুতোষ দত্ত ,নিরঞ্জন দত্ত তাঁদের শৈল্পিক প্রতিভাকে শঙ্খ শিল্পে রূপ দেন। ফলে তাঁদের হাতের ছোঁয়ায় শিল্পমন্ডিত সুচারু শাখা গুলি অন্যান্য অঞ্চলে প্রস্তুত শাখাকে প্রতিযোগিতায় পিছনে ফেলে দেয়। শঙ্খশিল্পে কাদিলপুর সুখ্যাতি অর্জন করে। শাঁখ কাটার করাতকে বলা হয় কাতি। সেই থেকে কাতিলপুর, আবার তা লোক মুখে মুখে কাদিলপুর হয়েছে বলে লোকবিশ্বাস। শঙ্খ শিল্পের সঙ্গে এ গ্রামের প্রাচীন একাত্মতা স্থাননামে এসেছে।

জয়ন্ত কুমার দত্তের দাবি অনুযায়ী ঐতিহ্যগত সংস্কারের বাইরে বেরিয়ে শাঁখাকে জুয়েলারি হিসাবে তুলে ধরা দত্ত পরিবারের বড় অবদান। শাঁখার নানা ডিজাইন পাওয়া যায়, যেমন– টালি, ইংলিশ প্যাঁচ, শিকলি বলা, আঙ্গুর পাতা ইত্যাদি। কেবল হাতে পরার শাঁখা নয় তৈরী হ হার, কানের দুল, ব্রোচ, পাঞ্জাবির বোতাম, আংটি, ধূপদালি, ওয়াল হ্যাঙ্গিং, পেপার ওয়েট নানা গৃহ শয্যার জিনিস ইত্যাদি। শাঁখা এবং পলার একত্র ডিজাইন, পলার মধ্যে শাঁখা বা শাঁখার মধ্যে পলা, অর্ধেক শাঁখা অর্ধেক তলা ইত্যাদি নানান বৈচিত্রপূর্ণ অলংকার এর ডিজাইন বাজারে এনেছেন তাঁরা। এক্ষেত্রে ভেঙে যাওয়া শঙ্খগুলি বা কাটতে গিয়ে আকৃতি না পাওয়া শাঁখা গুলিকে পুনর্বার আরো উচ্চমানের ডিজাইন হিসাবে ক্রেতা সমক্ষে তুলে ধরা সম্ভব হয়। যে শঙ্খের বহিরাবরণ পাতলা সেই শঙ্খ দিয়ে শাঁখা তৈরি হয় না, তৈরি হয় বাজানোর শাঁখ। আবার কোন শঙ্খের ভেতরের স্পাইরাল বা গাঁট যদি না থাকে তাহলেও সেই শঙ্খ দিয়ে শাঁখ তৈরি হয় শাখা তৈরি সম্ভব হয় না। কারণ, সে ক্ষেত্রে তা ভেঙ্গে যেতে পারে। অর্থাৎ, উৎকৃষ্ট মানের শঙ্খ দিয়ে শাঁখাই তৈরি হয় আর খুঁতযুক্ত শঙ্খ দিয়ে তৈরি হয় বাজানোর শাঁখ। সেক্ষেত্রে আঁঠা এবং প্লাস্টার সহযোগে সেই খুঁতটুকু ঢেকে দেওয়া হয় এবং তা বাজানোর কাজে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হয়। ৯০% বাজানোর শাঁখই এই খুঁতযুক্ত শঙ্খ দিয়ে তৈরি এবং তা রঙ করা থাকে, শঙ্খের স্বাভাবিক রঙের থেকে তাই তার রং হয় অতিরিক্ত সাদা। সাধারণত এশিয়ান পেইন্টস এর অয়েল পেইন্ট দিয়ে শাঁখের উপরে করা প্লাস্টারের ওপরে রং করা হয়। এরপরও থেকে যাওয়া ভঙ্গুর নিম্নমানের শাঁখাগুলি গুঁড়ো করে চুন তৈরী হয়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 338 - 345
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়াসহ পশ্চিমবঙ্গের নানান স্থানে রয়েছে দত্ত পরিবারের রূপম শঙ্খ শিল্পালয় এর ব্যবসায়িক বাজার। রাজ্যের বাইরেও তাদের শঙ্খ বিক্রির বাজার রয়েছে। এমনকি যান্ত্রিক এই যুগে অনলাইনেও নিজেদের সৃষ্টিকে তুলে ধরেন শঙ্খ শিল্পালয় এবং চলে ব্যবসা। সুজিত দত্তের মতে— 'করোনা পরবর্তীকালে কমবয়সী ছেলেরা পড়াশোনায় অমনযোগী হয়ে উঠেছে, অনেকেই তাড়াতাড়ি রোজগারের আশায় এই প্রেক্ষিতে কর্মে যোগ দিচ্ছে। ঠিকঠাক কাজ শিখে নিয়ে অনেকে মাসে ৪০০০০-৫০০০০ টাকা রোজগার করছে'। অর্থাৎ, এই ব্যবসা ও তার উৎপাদন উভয়তই অর্থকরী। ফলে এ পেশায় পারিবারিক পেশা থেকে যেমন অনেকে সরে যাচ্ছেন, তেমনি বহু মানুষ এই পেশার সাথে যুক্ত হচ্ছেন। শাঁখ এভাবে অর্থনৈতিক দৃঢ় ভিত্তিভূমিতে জীবন জীবিকার অন্যতর মাধ্যম হয়ে ওঠে। মেদিনীপুরে জেলা পরিষদের উদ্যোগে বঙ্গমাতা সোসাইটি নামে একটি সমিতি করা হয়েছিল শঙ্খ শিল্পীদের স্বার্থে। এই কমিটির উদ্যোক্তারা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দিয়ে বাইরে থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে আনতেন এবং তাদের কাছ থেকেই সাধারণ শিল্পী স্বল্পমূল্যে নির্ঝঞ্ঝাটে নির্ভয়ে কাঁচামাল কিনতেন। এমনকি সামান্য অর্থের বিনিময়েও অনেক সময় কাঁচামাল কিনতেন তারা। যদিও এই সমিতি বর্তমানে অবলুপ্ত হয়েছে।[১] তবে সরকারি নানা উদ্যোগে লোকশিল্পীদের সহায়ক নানা প্রকল্প শঙ্খ শিল্পীদেরও সহায়ক হয়ে উঠেছে। বাস্তবিকই সম্ভাবনাময় এই লোকশিল্পী টিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য লোকসংস্কৃতিপ্রেমী, ঐতিহ্যসম্পন্ন মানুষ এবং সরকার সকলকে একত্রে উদ্যোগ নিতে হবে। সামগ্রিক ইতিবাচক পদক্ষেপ এর মাধ্যমেই সম্ভাবনাময় শঙ্খশিল্প অনন্যতা অর্জন করবে।

Reference:

১. কর্মকার, লক্ষ্মণ (সম্পা), মেদিনীপুরের লোকসংস্কৃতি, সৃজন প্রকাশনী, কুশপাতা, ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, এপ্রিল ২০১৪, পৃ. ১০০-১০১

Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 338 - 345
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Bibliography:

কর্মকার, লক্ষ্মণ (সম্পা), মেদিনীপুরের লোকসংস্কৃতি, সৃজন প্রকাশনী, কুশপাতা, ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, এপ্রিল ২০১৪

চৌধুরী, ড. দুলাল, বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, একাদেমি অফ ফোকলোর, কলকাতা, ২০০৪

মিশ্র, দেবতুষি, লোকসংস্কৃতির রূপ ও স্বরূপ, সাহিত্য সঙ্গী, ১৪ এপ্রিল ২০১৬

সেনগুপ্ত, পল্লব, লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮

ক্ষেত্রসমীক্ষা ও ঋণ স্বীকার :

জয়ন্ত কুমার দত্ত, রূপম শঙ্খ শিল্পালয়, কলমিজোড়, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৩০ মার্চ–২ এপ্রিল

সমর দত্ত, শাঁখারি, কলমিজোড়, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৩০ মার্চ–২ এপ্রিল